কথাসাহিত্যে নজরুলের কৃতিত্ব

সুব্রত কুমার দাস

গত একশ' চল্লিশ বছরের বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র *কাঁদো নদী কাঁদো* একটি অন্যতম আধুনিক উপন্যাস। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের আত্মিক সংকটটি তীব্র। তার বিবরণও এমন এক অদৃষ্টপূর্ব ভাষায় ঘটেছে যেখানে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ তার আগের বিবরণ থেকে বারবারই বদলে যায়। কেননা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে প্রত্যক্ষতা তার বিবরণের সত্যতা বলে কিছু নেই। চরিত্রের আত্মিক এবং বিবরণকারীর বাহিরিক যে জটিলতা তা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে এত তীব্রভাবে পরিলক্ষিত না হলেও এ ধরনটি একেবারে অপরিচিত নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র পূর্বে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) এর *অন্তঃশীলা* (১৯৩৫), *আবর্ত* (১৯৩৭) ও *মোহনা* (১৯৪৩) ত্রয়ী উপন্যাস এবং পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) *জাগরী* (১৯৪৬) এবং *ঢোড়াইচরিত মানস* (১৯৪৯-১৯৫১)-এ এমন আভাস আমরা পেয়েছি। কিন্তু সে-আভাসের পূর্বসূত্র কি আমরা কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) উপন্যাস জগতে খুঁজতে পারি না? নাকি শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* বা বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস বিষয়ক প্রধান গ্রন্থগুলোতে যেহেতু কাজী নজরুল ইসলামের উল্লেখ নেই, তাই তিনি ঔপন্যাসিক পদবাচ্য নন? অথচ শুধু *বাঁধনহারা*-র দিকেই যদি নজর দিই দেখা যায় এতকালের যে প্রচলন অর্থাৎ একটি সুস্পষ্ট গল্প কাঠামোকে উপন্যাসে উপস্থাপন করা, তার ধারও নজরুল ধারেন নি। উপন্যাসটির ১৮টি পত্র জুড়ে নূরুল হুদার যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব এবং পরবর্তীকালের যে ঘটনা-বিবরণ আমরা পাই তাতে কিন্তু অনেক কিছুই অস্পষ্ট, সচেতনভাবেই অস্পষ্ট। নূরুল কাকে ভালবেসেছিল? মাহবুবাকে নাকি সোফিয়াকে? নাকি উভয়কেই? যুদ্ধে গিয়েছিল কেন? মাহবুবাকে বিয়ে করতে চায় নি বলে, নাকি দেশের প্রয়োজনকে বিয়ের চেয়েও বড় করে দেখেছিল বলে? গিয়েছিল কি নিজের ইচ্ছায়, নাকি মাহবুবাই তাকে জোর করে পাঠিয়েছিল? মাহবুবার বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় সোফিয়া কি খুশী হয়েছিল? ইত্যাকার বহু প্রশ্নই *বাঁধনহারা*-য় উত্তরহীন। অথচ উপন্যাস যখন শুরু হলো তখন মনে হলো সব কিছুরই সোজা সাপটা উত্তর রয়ে গেছে। এবং আমরা সেই উত্তরটাকে চিরসত্য ধরে নিয়ে এ ধরনের মূল্যায়ন করতে চাইলাম যে, *বাঁধনহারা* উচ্চ মার্গের উপন্যাস নয়, এটি ভাবালুতায় ভরা, গল্প কাঠামোটি দৃঢ় হয়নি, ইত্যাদি ইত্যাদি। লক্ষ করলে বোঝা যায়, *বাঁধনহারা*-য় এই রহস্যময়তা কিন্তু ঠিক ডিটেকটিভ নভেলের মতও নয়। গত শতাব্দীর আশির দশক বা নব্বইয়ের দশকে এমন রহস্যময়তা পৃথিবীর অনেক বড় বড় ঔপন্যাসিকের লেখাতেই আমরা পেয়েছি, যা কিনা নজরুল ষাট-সত্তর বছর আগেই উপস্থাপন করেছিলেন। শুধুমাত্র *বাঁধনহারাই* নয়, নজরুলের অন্যান্য গল্প-উপন্যাসে প্রকর্ষের এমন উদাহরণ কিন্তু প্রচুর। *বাঁধনহারা* বা নজরুলের অন্যান্য গল্প-উপন্যাস কেন যথাযথ সমালোচনা পেতে ব্যর্থ হয়েছে সে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় নয়। বরং আজ আমরা খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করব নজরুল তাঁর গল্প-উপন্যাসে এমন আর কী কী উপাদানের সন্নিবেশ ঘটিয়েছিলেন যেগুলো ছিল বাংলা কথাসাহিত্যের বিচারে সূচনাকালীন।

পৃথিবীর তাবৎ সৃষ্টিশীলতা ও প্রগতি যেহেতু সময়কে নির্ধারণ করে বিবেচিত হয় তাই নজরুলের কথাসাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে শুরুতে আমরা তাঁর গল্প-উপন্যাস রচনার সময়কালকে একটু

হিসেব করে নেব। বিশ বছরের নজরুল ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' লিখলেন এবং ১৯১৯ ও ১৯২০ সালের ভেতরেই বেরিয়ে গেল দুটি গল্পগ্রন্থ *ব্যথার দান* ও *রিক্তের বেদন*-এর সব গল্প। সাথে সাথে চললো *বাঁধনহারা*। তারপর পাঁচ/ছ' বছর বিরতি। তখন নজরুল জনপ্রিয় কবি। জেল খাটলেন, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা চলতে লাগল, নির্বাচন করলেন। ১৯২৬ এর শুরুতেই গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে; পরে নির্বাচনে হেরে পুরোপুরি স্থিত হলেন। শুরু হলো উপন্যাস। *মৃত্যুক্ষুধা* ও *কুহেলিকা*। দুয়েরই পত্রিকায় প্রকাশের সময় প্রায় একই। কোনটি আগে লিখেছিলেন? *কুহেলিকা*-র প্রথম কিস্তি আষাঢ় ১৩৩৪-এ *নওরোজ*-এ, আর *মৃত্যুক্ষুধা* অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ *সওগাত*-এ। শেষও হয়েছিল *কুহেলিকা* আগে। তাহলে কি *কুহেলিকা*-কেই নজরুলের দ্বিতীয় উপন্যাস অভিধা দেয়া উচিত, যদিও গ্রন্থাকারে *মৃত্যুক্ষুধা কুহেলিকা*-র প্রায় দেড় বছর আগে প্রকাশিত। এরপর আবার ছোটগল্পে ফিরে আসা। চারটি গল্প যা দিয়ে *শিউলিমালা* গ্রন্থটি এবং আরও পরে 'বনের পাপিয়া' লিখিত হয়েছে বলে অনুমান। 'বনের পাপিয়া' যে পরবর্তীকালে রচিত তা অনুমান করা যায় এর প্রধান চরিত্র রমলার বৈষ্ণব ভাবনা দেখে। নজরুলের মধ্যে বৈদিক দর্শন প্রবলভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পর। গল্পে ব্যবহৃত 'আমার পরম সুন্দর' শব্দবন্ধ ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আমার সুন্দর' নিবন্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়। এছাড়া পাপিয়ার মুখে 'পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা' এবং 'চোখ গেল চোখ গেল' বাক্যদ্বয় নজরুলের অনেকগুলো বহুলশ্রুত গানের কথা মনে করিয়ে দেয় যেগুলোর রচনাকাল ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী সময়। *বাঙ্গালী* পত্রিকার পৌষ কোরবানী সংখ্যায় ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল 'কাহারই তরে কেন ডাকে পিয়া পিয়া পাপিয়া...'। ১৯৩৩-এ *গুলবাগিচা*-য় প্রকাশিত হয় 'পিয়া পাপিয়া পিয়া বোলে...' গানটি। একই বছরের নভেম্বরে হিজ মাষ্টারস ভয়েসে নজরুলের 'পিউ পিউ বোলে/ পাপিয়া পিউ পিউ বোলে...' রেকর্ড করা হয় যা কিনা পরবর্তীতে *গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান* এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৩৪-এ *গীতিশতদল*-এ প্রকাশিত হয় 'পিউ পিউ বোলে পাপিয়া/বুকে তার পিয়ারে চাপিয়া...'। হিজ মাষ্টারস ভয়েস ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ে রেকর্ডে ধারণ করে 'পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে...' গানটি। 'পিয়া পিয়া', 'পাপিয়া' এবং 'চোখ গেল' নিয়ে রয়েছে নজরুলের আরও দুটি গান। 'চোখ গেল চোখ গেল... কেন ডাকিস রে' গানটি *বুলবুল*-এ গ্রন্থবদ্ধ হয়েছিল এবং 'পিয়া পিয়া পিয়া পাপিয়া পুকারে/ 'চোখ গেল বিরহিনী বধুর মনের কথা...' গ্রন্থবদ্ধ হয়েছিল *গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান*-এ। আর এ সকল কারণেই 'বনের পাপিয়া'-র রচনা কাল নিয়ে আমার এমন অভিমত।

কথাসাহিত্যিক নজরুলের প্রথম পর্যায় থেকেই নজরুল কিন্তু অভিনবত্বের অনুসন্ধানী। প্রথম গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'-তা কিন্তু কোন বাঙালি মুসলমানের লেখা প্রথম গল্প। গল্পের বিষয়বস্তু সৈনিকজীবন - তাও অধিকাংশ সমালোচকের মতে বাংলা সাহিত্যে প্রায় অদৃষ্টপূর্ব। বলার ধরনটিও নতুনত্বের দাবীদার বৈকি। তৃতীয় গল্প 'হেনা'-তেও আবার সেই সৈনিকজীবন। সাথে যুক্ত হয়েছে পটভূমিক ভিন্নতা। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সৈনিকজীবনকে বিশেষায়িত করেছেন, কিন্তু পটভূমি ফরাসী দেশের ভার্দুন ট্রেঞ্চ, সিন নদীর ধারের তাম্বু, প্যারিসের পাশের ঘন বন, হিন্ডেনবার্গ লাইন, বেলুচিস্তান, কাবুল ইত্যাদি। কল্পনাপ্রবণতায় এই যে উত্তুঙ্গ অবস্থা তা কিন্তু সমসাময়িককালে লেখা নজরুলের সকল গল্প-উপন্যাসেই লক্ষণীয়। আর সৈনিকজীবন? 'ব্যথার দান', 'ঘুমের ঘোরে', 'রিক্তের বেদন' প্রভৃতি গল্প এবং *বাঁধনহারা* উপন্যাসটিতো সৈনিকজীবন নিয়েই রচিত। নজরুলের আগে কি যুদ্ধ এত প্রবলভাবে এসেছে বাংলা কথাসাহিত্যে? হয়তো না আসার কারণটি এমন হতে পারে যে বাঙালি

জীবনে বড় কোনো যুদ্ধ আসেনি গত দু'শ বছরে। অনস্বীকার্য যে নজরুল এ ব্যাপারে অগ্রপথিক। সাথে সাথে একথাও ভোলা উচিত নয় যে এই সময়ে নজরুল সমাজ-বাস্তবতার ছবি নিয়েও গল্প লিখছেন। 'স্বামীহারা', 'রাক্ষুসী', 'জিনের বাদশা', 'পদ্মা-গোখরো' প্রভৃতি এমন কিছু উদাহরণ।

উপর্যুক্ত সব কটি গল্প-উপন্যাসেই নজরুলের আত্মজীবনীমূলক উপাদানের প্রাচুর্য রয়ে গেছে। *বাঁধনহারা*-র নূরুল হুদা তো সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে পোষাক-আচরণ ও জীবনদর্শনে পূর্ণতই নজরুল নিজে। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে *বাঁধনহারা*-র পূর্বে কি আছে? হ্যাঁ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শ্রীকান্ত* ১ম পর্বে রয়েছে। আর মীর মশাররফ হোসেনের গ্রন্থাবলী? অন্তত চারটি গ্রন্থ *উদাসীন পথিকের মনের কথা, গাজী মিয়াঁর বস্তানী, আমার জীবনী*, এবং *বিবি কুলসুম* আত্মজীবনীমূলক রচনা হলেও শুধুমাত্র ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *গাজী মিয়াঁর বস্তানী* উপন্যাসোপম একটি রচনা যাতে আত্মজীবনীমূলক উপাদান দৃশ্যমান। কিন্তু তারপরও স্বীকার করতেই হয় এ ধারাতেও নজরুল বিশিষ্ট। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে জীবনদর্শনের বহিঃপ্রকাশ নজরুলের *বাঁধনহারা*-তেই প্রথম।

একথা সত্য, নজরুল পূর্বে রচিত অল্প কয়েকজন হিন্দু ঔপন্যাসিকের উপন্যাস এবং মুসলমান রচিত অধিকাংশ উপন্যাসে মুসলিম সমাজ চিত্রিত হচ্ছিল। বাস্তবতার রূপায়ণ প্রশ্নে সেগুলো কতখানি সফল তা আর একটি প্রবন্ধের বিষয়। কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশই যে ইসলাম ধর্ম ও সমাজের রীতিনীতির জয়গানমূলক সাহিত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং নজরুলের ভিন্নতা এখানেই যে, তাঁর একেবারে প্রথম উপন্যাস *বাঁধনহারা*ও এ ধারার বাইরে। বেহেস্ত-দোজখের আলোচনা-মুক্ত এ উপন্যাস। শুধু কি তাই? এতে তো রয়েছে বরং ঈশ্বর-বিরোধিতার কথা। এমন ভাবনাও তো মুসলমান রচিত আর কারও উপন্যাসে পূর্বে লক্ষিত নয়। বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে এমন বিদ্রোহী ভাবনা কিন্তু তাঁর পরবর্তী উপন্যাস *মৃত্যুক্ষুধা*তেও দেখা যায়। সেজোবৌ আর তার শিশুর মৃত্যুতে অভিজ্ঞ মেজবৌ একসময় বলে 'আল্লাহ আজ আর তোমায় ডাকবো না'[১]। এছাড়াও নজরুলের অন্য আর একটি বিশিষ্টতা এই যে মুসলমান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর উপন্যাসেই খোলামেলাভাবে প্রেম বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে।

নজরুলের কথাসাহিত্যের প্রথম অর্থাৎ *ব্যথার দান, রিক্তের বেদন* এবং *বাঁধনহারা* পর্বে আরও যে বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষযোগ্য, তা হলো পত্র ও ডায়েরীর ব্যবহার। 'রাজবন্দীর চিঠি'র তো পুরো গল্পটাই একটা পত্র, যেমনভাবে *বাঁধনহারা* উপন্যাসটি একটি পত্রোপন্যাস। ডায়েরী-ধর্মিতাও রয়েছে। 'হেনা', 'রিক্তের বেদন' এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথাসাহিত্যে পত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নজরুলের বিশেষত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ১৮৮২ ও ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত যথাক্রমে নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বসন্তকুমারের পত্র* এবং অম্বিকাচরণ গুপ্তের *পুরানো কাগজ* ও *নথীর নকল* এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় হলেও সার্থক পত্রোন্যাসের প্রশ্নে এ দুটিকে সমালোচকেরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন না।

প্রথম পর্বে সাহিত্যকর্মে নজরুল আরও যে কাজটি করেন তাহলো মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার। সত্য, বাংলা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি*-তে, যার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল *চতুরঙ্গ*-তে (১৯১৬)। কিন্তু ১৯২০-এ পত্রিকায় প্রকাশিত *বাঁধনহারা*-তেও রয়েছে এ পদ্ধতির এক বিশেষ প্রয়োগ। পশ্চিমবঙ্গের আলোচক সোহারাব হোসেন বলেন,

> *চোখের বালি*-তে বা *চতুরঙ্গে* মানবের আঁতের কথার রূপায়ণ থাকলেও *বাঁধনহারা*-র মতো নিরবচ্ছিন্ন স্রোতধারা সেখানে অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথে একই সঙ্গে ঘটনাধারা আছে আবার মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু নজরুলে ঘটনা বিরল, কিন্তু মানব-ভাবনার অনিঃশেষ স্রোতপ্রবাহ আছে। এই ভাবনা-স্রোতের নামকে আমরা চেতনা প্রবাহ বলতে পারি। হ্যাঁ *বাঁধনহারা*-য় শুধু মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা নয়, একই সংগে আমাদের চেতনা স্রোতের লিপিরূপ দেওয়া হয়েছে।"[২]

এবার আসছি ভাষা প্রশ্নে। প্রথম থেকেই আমরা দেখলাম নজরুল তাঁর গল্প-উপন্যাসের ভাষাকে খুব বেশি মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাইছেন। প্রথম পর্বের লেখায় আরবি, ফারসি শব্দেরও প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। এবং এ পর্যায়ের শেষ দিকের গল্প 'রাক্ষুসী'তে দেখি তিনি আঞ্চলিক ভাষাকে কথাসাহিত্যের ভাষা করে ফেললেন সহজেই। বীরভূমের বাগড়দীদের ভাষায় রচিত 'রাক্ষুসী' গল্পটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিক ভাষার সাহিতকর্ম হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। ১৮৫৭-তে প্রকাশিত প্যারিচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলাল* এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় হলেও তা যে কথাসাহিত্য রচনায় সামগ্রিক ও সফল মাধ্যম হিসেবে সে-সময় প্রযুক্ত হয়নি তা সর্বজন স্বীকৃত। 'রাক্ষুসী'-তে আঞ্চলিক ভাষাকে ব্যবহারের যে প্রয়াস লক্ষ করা যায় তাই তো তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের উপন্যাস *মৃত্যুক্ষুধার* প্রধান অবলম্বন। ভাষা নিয়ে নজরুলের এই নিরীক্ষা পরবর্তীকালে রচিত তাঁর গল্পগুলোতেও লক্ষ করা যায়। 'অগ্নি-গিরি' গল্পে ময়মনসিংহের এবং 'জিনের বাদশা' গল্পে পূর্ববঙ্গের উপভাষার ব্যবহার বেশ মনোযোগ কাড়ে।

ভেবে দেখার মতো যে নজরুলের প্রথম পর্যায়ের দুটি গল্পগ্রন্থের যে গল্পটি সর্বশেষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা হলো *'রিক্তের বেদন'*। ঐ মাঘ ১৩২৭ বঙ্গাব্দেই *বাঁধনহারার* সর্বশেষ কিস্তি প্রকাশিত হয়। ঠিক সাড়ে দু'বছর পর শুরু হলো দ্বিতীয় পর্ব। *কুহেলিকা*-র প্রথম কিস্তি এলো। যদিও উপন্যাসটির রচনাকাল ও রচনাস্থান এতদিনেও নির্ধারণ করা যায় নি। কিছুদিন পরে একই সাথে শুরু হলো *মৃত্যুক্ষুধাও*। কোথায় *কুহেলিকার* সাধুরীতি আর কোথায় *মৃত্যুক্ষুধা*-র আঞ্চলিক ভাষা, মধ্যবিত্তের *কুহেলিকা* আর প্রধানত ব্রাত্যজনের *মৃত্যুক্ষুধা* সমকালের নজরুলের দুটি সত্তা কি?

ব্রাত্যজন যে *মৃত্যুক্ষুধা*-য় প্রথম এসেছে তা নয়। 'রাক্ষুসী'ও কিন্তু ব্রাত্যসমাজেরই কথা। 'রাক্ষুসী'-র বাগদী মেয়েটি অস্পৃশ্য। বর্ণগত প্রশ্নে ব্রাত্য সে। আর *মৃত্যুক্ষুধা*-র মেজবৌ ও তার পরিবার তো অস্পৃশ্য অর্থনীতির প্রশ্নে। নজরুলের পূর্বে বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য বর্ণের মানুষ নিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের গল্প রয়েছে একাধিক। এমনকি তাঁর *গোরায়* বা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন কোন গল্প যেমন 'বিলাসী', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' 'পণ্ডিত মশাই', বা উপন্যাস *বামুনের মেয়ে, পল্লীসমাজ, দেনা পাওনা* প্রভৃতিতে ইতিমধ্যে ব্রাত্যসমাজ স্থান পেয়েছে। কিন্তু নজরুলের অসাধারণত্ব এই যে তিনি সে-সমাজকে দেখেছেন ভেতর থেকে, তাঁর পূর্বসূরিদের মতো বাইরে থেকে নয়। তাছাড়া নজরুল আরও অতিরিক্ত যে কাজটি করেছেন তাহলো তিনি সে-সমাজের মানুষের মুখে সভ্য সমাজের ভাষা না দিয়ে তাদের নিজেদের ভাষা দিয়েছেন। *মৃত্যুক্ষুধাতো* খ্রিষ্টান সমাজেরও কথা। একথা সত্য খ্রিষ্টান পাত্র-পাত্রী নিয়েই বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রয়াস ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হ্যানা ক্যাথারীন ম্যালেন্স এর *ফুলমণি* ও *করুণার বিবরণ* গ্রন্থটি। কিন্তু সে তো ছিল নীতিকথা। নজরুল তাঁর *মৃত্যুক্ষুধায়* সে-খ্রিষ্টানকে জীবন্ত চরিত্র বানিয়েছেন। *মৃত্যুক্ষুধায়* আরও অভিনবত্ব আছে। এর আনসারই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাম্যবাদী চরিত্র। এছাড়াও মেজবৌ ঘর থেকে বেড়িয়ে আসা এমন নারী যার সন্তান আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের *চন্দ্রশেখর*-এর শৈবলিনী,

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-এর চারুলতা, শরৎচন্দ্রের *গৃহদাহ*-এর অচলা সবাই ঘর ছেড়েছে। কিন্তু তাদের সন্তান ছিল না। সন্তান যার ছিল সেই কুমু কিন্তু আবার ঘরেই ফিরে এসেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা লিয়েফ তলস্তোয়ের *আনা কারেনিনা*-র আনা ঘর ছেড়েছিল সন্তান রেখে ঠিকই, কিন্তু প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলা যায় তা ছিল প্রেমের জন্য। অথচ নজরুল মেজবৌকে সন্তান থেকে, ঘর থেকে দূরে নিয়ে গেছেন মানুষ হওয়ার আশায়।

সত্য, সমসাময়িককালের রচিত *কুহেলিকা* কাঠামো প্রশ্নে নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের দাবীদার হলেও সৃষ্টিশীলতার প্রশ্নে *মৃত্যুক্ষুধা*র তুলনায় মেধার সাক্ষর রাখে নি। এছাড়া তিনি যে কাজটি করেছেন তাহলো বিশেষ দর্শনের বহিঃপ্রকাশ যা নজরুলের পরিপক্ক লেখকসত্তার পরিচায়ক। হিন্দু রমণী বিবাহ করায় এবং নিজে মুসলমান হওয়ায় একটা সামান্য বাসা ভাড়া পেতেও তাঁকে কত না বেগ পেতে হয়েছে। আর ইতোমধ্যে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে শুরু হলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সে সময়ে মুসলমানের যে আইডেনটিটি সংকট তাতে নজরুল নিজে হয়তো মহৎ মানুষ হওয়ার কারণে ভোগেন নি, কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন হাড়ে হাড়ে। আর সে সংকটকে অতিক্রমণের বার্তা নিয়ে রচিত হলো *কুহেলিকা*। জাহাঙ্গীরের অন্বিষ্ট মুসলমানত্ব নয়, ভারতীয়ত্ব। শুধু কি তাই, নজরুলের জাহাঙ্গীরই তো প্রথম মুসলমান সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। তাছাড়া অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম যেমন বলেন, জাহাঙ্গীরই তো বাংলা উপন্যাসের প্রথম নায়ক যে কিনা জারজ বা কামজ সন্তান[৩]।

নজরুলের কথাসাহিত্যের দ্বিতীয় পর্বের সর্বশেষ নিদর্শন তাঁর ছোট গল্পের বই *শিউলিমালা*। নামগল্পটি বাদে বাকি তিনটি গল্পই গ্রামীণ পটভূমিকায় রচিত। *শিউলিমালা*-তে গল্প-কাঠামোর ব্যাপারে তিনি খুব সচেতন হয়ে উঠেছেন, যদিও সর্বত্র সে-সচেতনতা ফুটে উঠেছে এমন দাবী করা চলে না। তবু পূর্ববর্তী গল্পগ্রন্থদ্বয়ে যে ভাবালুতা ও রোমান্টিকতা ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তা এখানে অন্তর্হিত। 'শিউলিমালা' গল্পে আমরা সাক্ষাৎ পেলাম শহুরে সভ্য, শিক্ষিত, মার্জিত লোকজনের যাদেরকে নজরুলের গল্পে ইতিপূর্বে খুব বেশি দেখা যায় নি[৪]। সর্বশেষ গল্প 'বনের পাপিয়া'ও তাই। 'শিউলিমালা' থেকে 'বনের পাপিয়া'-র পার্থক্য বা বিশেষত্ব এখানেই যে, অতিরিক্ত হিসেবে সেখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়েছে। আমার মতে, 'পদ্ম-গোখরো' থেকেও 'বনের পাপিয়া' সে কারণে উৎকৃষ্টতর। একথা সত্য, 'পদ্ম-গোখরো'-তে জোহরার যে অতৃপ্ত মাতৃত্ব সেটাই 'বনের পাপিয়া'-র প্রতিপাদ্য। কিন্তু অতিরিক্ত যে প্রতীকী ব্যঞ্জনা তা হলো পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলন। 'একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ পরম স্বামী, বাকি সব প্রকৃতি' গীতার এই দর্শন রমলার চৈতন্যে ক্রিয়াশীল। পরমাত্মার প্রতিনিধি রূপী পাখিটি যখন তাকে ত্যাগ করে তখন তার জীবন হয়ে পড়ে অর্থহীন। ব্যাকুল রমলা নদীতে জীবন বিসর্জন দিয়ে পরমাত্মার প্রতি ধাবিত হয়। হিন্দু দর্শন নিয়ে এমন প্রতীকী গল্প রচনাতে রজরুলই কি প্রথম নাম?

হয়তো আমরা একথা মানতে বাধ্য, কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর গল্পকার ও ঔপন্যাসিকদের তালিকায় পড়েন না। কিন্তু এর অর্থ এমন হওয়া অনুচিত যে, তিনি বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থগুলোতেও অন্তর্ভুত হওয়ার অনুপযুক্ত। মাত্র ঊনিশটি গল্প এবং তিনটি উপন্যাসে তিনি এমন অনেক মেধাবী সাক্ষর রেখেছেন যা পূর্বসূরি, এমনটি সমসাময়িক শক্তিমান কথাসাহিত্যিকদের রচনাতেও দেখা যায় নি। আর নজরুল তো শক্তিমান প্রধানত কবিতা ও গানে। হয়তো সে-জন্যেই তাঁর কথাসাহিত্যেও কাব্যিক সংক্রমণটি অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া তাঁর সকল গল্প উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ মুসলমান সম্পাদক ও গোষ্ঠী পরিচালিত পত্রিকায় হওয়ায় পাঠক

সমাজের সিংহভাগ হিন্দুধর্মীয়দের কাছে সেগুলো পৌঁছতে পারে নি। এবং সে-কারণেই হয়তো সাহিত্য গবেষক-সমালোচকের পাঠের বাইরে সেগুলো চলে যায়। সম্ভবত সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন বাংলা গল্প-উপন্যাসের ইতিহাসে নতুন পরিমার্জনা আবশ্যিক হবে শুধুমাত্র কথাসাহিত্যিক নজরুলকে সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজনেই।

তথ্যসূত্র

১. কাজী নজরুল ইসলাম, *মৃত্যুক্ষুধা, নজরুল রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), নতুন সংস্করণের প্রথম পুণর্মূদ্রণ, ১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৮৩।
২. সোহারাব হোসেন, 'ঔপন্যাসিক নজরুলঃ নতুন যুগ-সৃষ্টির প্রয়াস', *পশ্চিমবঙ্গ* (কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মরণ), ১৪০৬, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫।
৩. রফিকুল ইসলাম, 'নজরুলের কথাসাহিত্য', *সচিত্র বাংলাদেশ* (নজরুল সংখ্যা), ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০২, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৩।
৪. মিজানুর রহমান খান, 'নজরুলের ছোটগল্পঃ বিষয় ও শৈলিবিচার', *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা* (নজরুল জন্মশতবর্ষ সংখ্যা), ১৯৯৯, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪৬৯।

সহায়ক প্রবন্ধসমূহ

১. 'বাঁধনহারা', রাজিয়া সুলতানা, *নজরুল একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা, হেমন্ত ১৩৭৬।
২. 'নজরুল ইসলামের উপন্যাস', সাইদুর রহমান ভুঁইয়া, *সাহিত্য পত্রিকা* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), উনবিংশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬।
৩. 'কথাশিল্পী নজরুল ইসলাম', আতোয়ার রহমান, *নজরুল বর্ণালী*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৪।
৪. 'নজরুলের ছোট গল্প', আবু রুশদ, *নজরুল সমীক্ষা*, নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।
৫. 'বাংলা উপন্যাসে কাজী নজরুল ইসলাম', সুমিতা চক্রবর্তী, *নজরুল: শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য*, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং নেতাজি ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ, কলকাতা, ১৯৯৯।
৬. 'নজরুলে গল্প-উপন্যাস', সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, *কোরক সাহিত্য প্রত্রিকা* (নজরুল সংখ্যা), কলকাতা, ১৯৯৯।
৭. 'নজরুলের গল্প' কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, তদেব।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১. *ধ্রুপদী নায়িকাদের কয়েকজন*, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০০।
২. *বাংলা কথাসাহিত্য: মুসলিম চরিত্র পরিবার ও সমাজ* (১৮৫৮-১৯৩৮), শেখ আতাউর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১।
৩. *নজরুল সাহিত্য বিচার*, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ইফাবা প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯।
৪. *বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ* (১৯২৩-৪৭), ড. সুবোধ দেবসেন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৯।

৫. *বাংলা উপন্যাসের শিল্পরীতি*, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮২।
৬. *সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য*, অলোক রায় (সম্পা.), সাহিত্যলোক, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৯৩।
৭. *নজরুল প্রতিভা*, লায়েক আলি খান, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৮।
৮. *বাংলা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস*, ড. নজরুল ইসলাম, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯২।
৯. *নজরুলের কথাসাহিত্য: মনোলোক ও শিল্পরূপ*, আহমেদ মাওলা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।

(সুব্রত কুমার দাস বাংলাদেশের উপন্যাস নিয়ে নির্মিত ওয়েবসাইট www.bangladeshinovels.com এর লেখক। ইমেইল: subratakdas@yahoo.com)